বদিউজ্জামান
সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক

কে এম মাসুম

সবুজপত্র

লেখকের কথা

প্রাচীন কৃষি সভ্যতার অন্যতম দেশ তুরস্ক। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কন্সটান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এক হাজার বছরের রাজধানী ছিলো। ১৪৫৩ সালে উসমানী তুর্কিদের হাতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর তুর্কিরা চারশত বছর যাবত বিশাল এই সাম্রাজ্য শাসন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত 'উসমানী খিলাফত' বলে পরিচিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলো, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ইরাক, ইসরাইল, সৌদি আরব, ইয়েমেন এবং এজিয়ান দ্বীপসমূহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগদান করে এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভুখণ্ড হারায়। সেই সাথে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতীক উসমানী খেলাফতের পতন ঘটে ১৯২৪ সালে। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিলো। ১৯৫২ সাল থেকেই দেশটি ন্যাটো (NATO) জোটের সদস্য। ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত এই দেশটিকে আধুনিকীকরণের নামে ইসলামের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হয়। আরবীতে আযান নিষিদ্ধকরণ, আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ থেকে শুরু করে ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ করে তুর্কি জাতীয়তাবাদের নামে যে উন্মাত্ততা এবং উগ্রতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছিলো, ইতিহাসে তা এক বিরল ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দেশটিতে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত, সামরিক অভ্যুত্থান চলে। কামাল আতাতুর্ক ইউরোপীয়করণ ও ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি পাশ্চাত্ত মনোভাবের অধিকারী একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলায় বার বার তুরস্কে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীকে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রদান করায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পিছনে তুরস্কের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী, আলেমসমাজ এবং গণতন্ত্রমণা সর্বশ্রেণীর জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করা স্বত্ত্বেও কামাল আতাতুর্ক ও তার প্রতিষ্ঠিত দল তুরস্ককে আধুনিকীকরণ ও জাতীয়তাবাদের নামে বি-ইসলামীকরণ (de-

Islamisation) করে। সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসী ও তাঁর অনেক অনুসারীরা তখন বাধ্য হয়ে তুরস্কের শাসকগোষ্ঠী থেকে দূরে সরে যান। রাজনৈতিক ময়দানে অসম যুদ্ধ করার পরিবর্তে সাঈদ নুরসী সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এটা ছিলো তাঁর এক দারুণ কৌশল পরিবর্তন। দীর্ঘ বন্দী জীবনে তিনি অসংখ্য ছাত্র-অনুসারী তৈরি করেছেন এবং লিখেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'রেসালায়ে নূর'। কয়েক দশকের মধ্যে তাঁর অনুগামী ছাত্ররা তুরস্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কাজ করে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। নাজমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি 'সালামত পার্টি' (National Salvation Party) ওয়েলফেয়ার পার্টি, ফাজিলত পার্টি (ভার্চু পার্টি) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তুর্কি জনগণ অত্যন্ত কৌশলে নানা বাধা-বিপত্তি মুকাবিলা করে বর্তমানের স্থিতিশীল মধ্যমপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন করেছে। ধর্মহীনতার গতিরোধ করে তুর্কি জনগণকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ময়দান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যে ভূমিকা সাঈদ নুরসী এবং তার অনুসারী ছাত্ররা পালন করেছেন তা অবিস্মরণীয়। তুরস্ক আজ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতেও তুরস্কের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এসবের পিছনে পর্দার অন্তরাল থেকে শক্তি যুগিয়েছেন সাঈদ নুরসী'র ব্যাপকভিত্তিক গভীর কর্মতৎপরতা।

বাংলাভাষীদের মাঝে সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসীকে পেশ করার উদ্দেশে আমার এই প্রচেষ্টা। আশা করি, অত্র গ্রন্থ পাঠ করে সুধি পাঠকবৃন্দ সমকালীন একজন দূরদর্শী, বিচক্ষণ সংস্কারক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ দীনের জন্য আমার এই খিদমতটুকু কবুল করুন এবং পরকালে নাজাতের উসিলা হিসেবে গণ্য করুন, আমীন!

দু'আ প্রার্থী
কে এম মাসুম

[এক]

জন্ম ও শৈশব

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী ১৮৭৭ সালের বসন্তের এক সকালে পূর্ব তুরস্কের তিবলিস প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম নুরসে জন্মগ্রহণ করেন। লেইফ ভ্যাসের দক্ষিণে তাউরাস পর্বতমালার পার্শ্বে অবস্থিত উপত্যকায় নুরস গ্রামের এক মনোরম বাড়িতে যখন সাঈদ নুরসীর জন্ম হয় তখন ছিলো উসমানী খেলাফতের পড়ন্ত বেলা। তার জন্ম থেকেই এই শিশুটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের। পৃথিবীতে আগমনের সময় থেকেই তার দৃষ্টি ছিলো এমন যাতে উপস্থিত সকলেই হয়েছিলেন বিস্মিত এবং বিমোহিত। শিশু সাঈদ কোনো ক্রন্দন করেনি এবং মনে হচ্ছিলো, সে যেন কিছু বলতে চাচ্ছে। তার কানে আযান শোনানোর পরই নাম রাখা হয়েছিল সাঈদ। সাঈদের মাতার নাম ছিলো নুরী এবং পিতার নাম মির্জা। একখণ্ড ছোট জমির মালিক এ পরিবারটি ছিলো কুর্দী গোত্রভুক্ত। সাঈদ ছিলেন এ পরিবারের সাত সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। বড় দুই সন্তান সাঈদের বোন দুরিয়া এবং হানুমা। এরপর তৃতীয় সন্তান সাঈদের বড় আব্দুল্লাহ। সাঈদের পর ছোট দুই ভাই মেহমেদ ও আব্দুল মেজিদ এবং সবার ছোট বোন মেরজান।

সাঈদের পিতার পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন তাইগ্রিস তীরের সিজার এলাকা থেকে এবং মাতা নুরীর জন্ম নুরস গ্রাম থেকে তিন ঘণ্টার দূরত্বের বিলদিন গ্রামে। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং পুণ্যবান। সাঈদের মাতা নুরী ইন্তেকাল করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। সাঈদ বলেছেন, "আমি আমার মাতার নিকট থেকে শিখেছি সহমর্মিতা এবং পিতার নিকট শিখেছি শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা।" সাঈদ তার শৈশবকাল কাটিয়েছেন পরিবারের সাথে নুরস গ্রামেই। শিশু সাঈদ ছিলেন কৌতূহলী এবং প্রতিটি ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু। কোনো ঘটনা ঘটলে তার কারণ জানতে চাইতেন এবং অনেক অনেক প্রশ্ন করতেন। সাঈদ ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং মেধাবী।

যখনই সুযোগ হতো বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যায় যে সব ধর্মীয় সভা-সমাবেশ বা আলোচনা হতো সাঈদ তাতে গভীর মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যে সব আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নিতো তার প্রতি কিশোর সাঈদ খুবই আগ্রহী ছিলেন। "সুফী

সাধক আব্দুল কাদির জিলানীর শিক্ষা দ্বারা সাঈদ অনেক প্রভাবিত হলেও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর পড়াশুনার কারণেই তিনি সুফী তরিকায় যোগদান করেননি তখনও।" এটা সাঈদের নিজের বক্তব্য। সাঈদ নয় বছর বয়সে স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই সাঈদের মনোভাব ছিলো যুদ্ধংদেহী এবং সহপাঠী এবং সিনিয়র ছাত্রদের সাথেও সাঈদ বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এটা ছিলো তার অসাধারণ মেধার কারণে। দুরন্ত সাঈদ কারও নিকট পরাস্ত হতে রাজি ছিলেন না। তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের ব্যাপারে সাঈদ হতাশ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে মোল্লা মেহমেদ একিন এফেনিদর মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে মেহমেদ নামক এক ছাত্রের সাথে তার সংঘর্ষের পর সে মাদরাসাও তিনি পরিত্যাগ করেন। আবার তার গ্রামে ফিরে এসে তার পিতাকে বলেন, আরেকটু বড় না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবেন না। অন্য ছাত্রদের থেকে আকৃতিতে ছোট থাকার কারণে সাঈদ কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে পারছিলেন না। ফলে তার শিক্ষালাভে সংকোচিত হয়ে যায় সপ্তাহে একদিনে অর্থাৎ তার ভাই আব্দুল্লাহর নিকট সপ্তাহে একদিন পড়ালেখা করতে থাকেন।

দশ বছর বয়সে সাঈদ আবার নিয়মিত পড়াশুনা শুরু করে প্রথমে তিনি পিরমিস গ্রামের মাদরাসায় এবং পরে হিজানে নকশবন্দী সাঈদ নূর মোহাম্মদের মাদরাসায়। সেখানেও ছাত্রদের সাথে শুরু হয় তার সংঘাত-সংঘর্ষ। সাইয়েদ নূর মোহাম্মদের সাথে কিছুদিন অবস্থান করার পর সাঈদ তার ভাই আব্দুল্লাহর সাথে নুরসিন গ্রামের আরেক মাদরাসায় যান। এখানেও মাদরাসার লেখাপড়ায় তিনি তুষ্ট হতে পারেননি।

স্বাধীনচেতা সাঈদ

এ সময় পূর্ব আনাতোলিয়ায় মাদরাসায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষক চাইলে তার পছন্দমত কোনো গ্রামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি পেতেন। যদি তার সামর্থ্য থাকতো তাহলে ছাত্রদের খরচপত্র তিনি নিজে চালাতেন আর তা সম্ভব না হলে জনগণের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তা দিয়ে মাদরাসা পরিচালনা করতেন। গ্রামবাসীর যাকাত ও আর্থিক সাহায্যেই ঐসব মাদরাসা পরিচালিত হতো। শিক্ষকরা ছাত্রদের পড়ানোর জন্য কোনো বেতন-ভাতা নিতেন না। কিন্তু যুবক সাঈদ যাকাতের অর্থ গ্রহণে কোনক্রমে রাজি ছিলেন না। অন্যের কোনো সাহায্য নেয়াটাকে তিনি তার জন্য গ্রহণযোগ্য মনে

করতেন না। একদিন মাদরাসার ছাত্ররা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহের জন্য বের হয়। কিন্তু সাঈদ তাদের সাথে যেতে রাজি হননি।

গ্রামবাসী তার এই স্বাধীনচেতা মনোভাব দেখে তার প্রশংসা করে এবং খুবই বিমোহিত হয়। তারা নিজেরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তাকে তা দিতে চেষ্টা করে। সাঈদ তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমতাবস্থায় গ্রামবাসী তার ভাই আব্দুল্লাহকে সংগৃহীত অর্থ এই আশায় দান করেন যে আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাই সাঈদকে তা নিতে সম্মত করাতে পারবেন। অতপর দুই ভাইয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরূপ :

সাঈদ : এ টাকা দিয়ে আমাকে একটি রাইফেল কিনে দাও।
আব্দুল্লাহ : না, এটা সম্ভব নয়। আহ
সাঈদ : তাহলে আমাকে তা দিয়ে একটি রিভলবার কিনে দাও।
আব্দুল্লাহ : না সেটাও সম্ভব নয়।
সাঈদ হেসে বলেন, ভালো কথা কমপক্ষে আমাকে একটি ছুরি কিনে দাও। তার এ আবদার শুনে সাঈদের ভাই আব্দুল্লাহ হাসেন এবং বলেন, কোনটাই সম্ভব নয়।

গ্রামে অবস্থান ও মহানবী সা. কে স্বপ্নে দর্শন

এ বছরই শীতে সাঈদ নিজ গ্রাম নুরসে অবস্থান করেন এবং এক মহান স্বপ্ন দেখেন যা তাকে পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। তিনি স্বপ্নে দেখছিলেন শেষ দিনের ঘটনা এবং দুনিয়া ধ্বংস হচ্ছিলো। সাঈদদের ইচ্ছা জাগলো মহানবী সা.-এর দর্শনের। এ বিষয়ে যখন তিনি ভাবছিলেন যে কিভাবে মহানবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তখন তার মাথায় বুদ্ধি আসলো যে পুলসিরাতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সাক্ষাৎ হতে পারে কারণ সবাইকে তো এ পথেই যেতে হবে। যখন মহানবী সা. ঐ পথে যাবেন সাঈদ ভাবলো, আমি দেখা করবো এবং তার হাতে চুমো খাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। সাঈদ গিয়ে সেই সেতুর পাশে বসলেন এবং যতো নবী রসুল সে পথে গেলেন সবার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের হাতে চুমো দিলেন। অবশেষে আসলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.। সাঈদ এগিয়ে গেলেন এবং সালাম দিয়ে মহানবীর সা. হাতে চুমো খেলেন এবং তাঁকে যেন আল্লাহ জ্ঞান দান করেন এ জন্য মহানবীর সা. দোয়া চাইলেন। মহানবী সা. বললেন, "কুরআনের জ্ঞান তোমাকে দান করা হবে এই শর্তে যে তুমি আমার কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবে না।" এতে সাঈদ দারূণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলেন।

এরপর থেকে তিনি অন্য কোনো পণ্ডিত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করাটাকে তার নিজের জন্য একটি বিধান করে নিলেন। এমন কি যখন তিনি জ্ঞানের অন্বেষায় ইস্তাম্বুল গেলেন তখনও এ বিধান মেনে চললেন এবং কেবলমাত্র তাকে যেসব প্রশ্ন করা হলো শুধু তারই জবাব তিনি দিতেন।

মহানবী সা. কে স্বপ্নে দেখার পর তার গ্রাম নুরস ছেড়ে প্রথমে আওয়াস গ্রামে এবং অতঃপর বিতলিসে শেখ তামিন এফেন্দির মাদরাসায় গেলেন। সঙ্গীদের বয়স কম দেখে শেখ এফেন্দি নিজে সাঈদকে পাঠদান না করে তার এক ছাত্রকে এ জন্য নিয়োজিত করলেন। এতে সাঈদ আত্মসম্মানে আঘাত পান এবং অপমান বোধ করেন। একদিন শেখ এফেন্দি মসজিদে ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এ সময় সাঈদ দাঁড়িয়ে আপত্তি করে বললেন, স্যার আপনি ভুল করছেন এবং যা বলছেন তা সঠিক নয়। শেখ এফেন্দি এবং তার ছাত্রগণ বিস্ময়াভিভূতভাবে সাঈদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এ ঘটনার পরও সাঈদ লক্ষ্য করলেন শেখ এফেন্দি তাকে নিজে পড়ানোর সৌজন্যতাটাও দেখালেন না।

এর অল্পদিন পরই সাঈদ মোল্লা আব্দুল করিমের মীর হাসান ওয়ালী মাদরাসায় ভর্তি হলেন। এখানে যখন তিনি দেখলেন যে নীচের শ্রেণীর নতুন ছাত্রদের কোনো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না তখন তিনি প্রথম সাতটি কিতাব বাদ দিয়ে অষ্টম কিতাবটি অধ্যয়নের ঘোষণা দিলেন। এখানেও তিনি মাত্র কয়েকদিন থাকলেন এবং ভ্যানের নিকটবর্তী বাস্তানে গেলেন। সেখানে মাসখানেক কাটানোর পর এরজুরুম প্রদেশে মোল্লা মেহমেদের বিখ্যাত বায়েজিদ মাদরাসায় ভর্তি হলেন সাঈদ। প্রকৃত পক্ষে এখানেই সূচনা হলো তার সত্যিকার শিক্ষা লাভের। এ পর্যন্ত তিনি আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি ও বাক্যগঠন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিলেন।

বায়েজিদ মাদরাসায় এক অসাধারণ ছাত্র সাঈদ

বায়েজিত মাদরাসা শেখ মেহমেদ জালালীর অধীনে সাঈদ মাত্র তিন মাস অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই তিন মাসেই ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার পড়াশুনার ভিত্তি রচিত হয় যা পরবর্তীতে তার চিন্তা ও কর্মের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাঈদের অসন্তোষ ও অনাগ্রহের প্রকাশ এখানেও ঘটে। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই তার মধ্যে এই সচেতনতার প্রকাশ ঘটে যে এ শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অতি জরুরী। অল্প সময়ে তিনি অসংখ্য বই পড়ে ফেলেন এবং তা আত্মস্থ ও মুখস্থও করেন। তার প্রখর স্মৃতিশক্তি, অসাধারণ মেধা কোনো বিষয়ে জ্ঞান আহরণের

বিস্ময়কর সামর্থ্য তাকে তার বয়সের যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। উল্লেখ্য যে এ সময় তার বয়স ছিলো মাত্র চৌদ্দ বছর।

বায়েজিদে অবস্থানকালে মাদরাসার সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত করে ফেলেন। তিনি সে সব কোর্সের মূল বই, ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাসহ সামগ্রিক বিষয়ের উপর গভীর দখল ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। পদ্ধতিটি ছিলো একটি বই শেষ করে আরেকটি বই পড়া। এ পদ্ধতিতে ডিগ্রি লাভে সাধারণ ছাত্রদের প্রায় পনের থেকে বিশ বছর সময় লেগে যেতো। সাঈদ মোল্লা জামী পাঠ থেকে শুরু করে সমস্ত কিতাব পাঠ শেষ করেন খুবই অল্প সময়ে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ার পরিবর্তে বইটি মূল বিষয় তিনি পাঠ করলেই সবকিছু তার নিকট পরিষ্কার হয়ে যেত। এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে শেখ মেহমেদ জালালী তাকে জিজ্ঞেস করেন সাঈদ তুমি কেন এ পদ্ধতিতে পড়ালেখা করছো।

সাঈদের জবাব ছিলো পরিষ্কার। "এতসব বই আমি পড়তে পারবো না। আমার জানা দরকার ঐ সব বইতে কি আছে। তাতে আমি বুঝতে পারবো কি আলোচনা করা হয়েছে এবং আমি আমার জন্য উপযুক্ত বইগুলোই শুধু পড়বো।" এ বক্তব্যের মাধ্যমে সাঈদ বুঝাতে চেয়েছেন যে মাদরাসায় যা পড়ানো হচ্ছে তার অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় এবং এ সবের সংস্কার প্রয়োজন আছে। সাঈদের মেধাশক্তি এতটাই প্রখর ছিলো যে, কোনো বই কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই তিনি বুঝতে এবং আত্মস্থ করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি যখন কোনো বই অধ্যয়ন করতেন তা এতটাই মনোনিবেশ সহকারে করতেন যে উক্ত গ্রন্থের যে কোনো প্রশ্নের জবাব নিজেই তৈরি করতে পারতেন। বায়েজিদ মাদরাসায় অবস্থানকালে সাঈদ পুরো সময়টা এমনকি রাতেও কাটাতেন বিখ্যাত কুর্দী সাধক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আহমেদ হানির সমাধিস্থলে। এক রাতে সাঈদের সহপাঠীগণ তাকে মাদরাসায় না পেয়ে অনুসন্ধান শুরু করে এবং অবশেষে আহমেদ হানির সমাধিস্থলে তাকে পাওয়া যায়। সাঈদ সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে গভীর অধ্যয়নে নিয়োজিত। কিন্তু সাঈদ বিরক্ত হয়ে তার বন্ধুদের বলে, তোমরা কেন এভাবে আমাকে ডিস্টার্ব করছো? সাঈদ একদিকে গভীর অধ্যয়নে এবং অন্যদিকে নিজেকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও তপস্যার অনুশীলনে নিয়োজিত করে। তিনি শুরু করলেন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা।

কিন্তু এতেও তিনি আত্মতুষ্টি খুঁজে না পেয়ে মহান ইমাম গাজ্জালীর দর্শন অনুসরণ করা শুরু করলেন। খানাপিনা দারুণভাবে কমিয়ে দিলেন এবং কথা বলাও এক রকম বন্ধ করে দিলেন। তিন মাস শেষ হলে সাঈদ শেখ মেহমুদ জালালীর বায়েজিদ মাদরাসা থেকে ডিপ্লোমা লাভ করে মোল্লা সাঈদ হিসেবে

পরিচিতি পেলেন। অতঃপর তিনি সহজ সরল দরততবেশি বেশ ধারণ করে বাগদাদে বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর সমাধিস্থল পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সড়ক পথ পরিহার করে রাত্রি বেলায় পর্বতসংকুল বন জঙ্গলের পথে বিতলিসে হাজির হলেন। সেখানে তিনি দু'দিনব্যাপী শেখ মেহমুদ এফেন্দির ভাষণ শুনলেন। শেখ তাকে শিক্ষকদের পোশাক পরিধানের প্রস্তাব করলেন। পূর্ব আনাতোলিয়ায় সেই সময় শিক্ষার্থীদের পাগড়ি এবং গাউন পরিধানের রীতি ছিলো না। শুধুমাত্র ডিপ্লোমা প্রাপ্তগণই তা পরিধান করতেন। শিক্ষকগণ এ পোশাক পরতেন। কিন্তু মোল্লা সাঈদ শেখ মেহমুদের প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে তিনি এখনও এই পোশাকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। একজন সম্মানিত শিক্ষকের পোশাক তিনি তো পরিধান করতে পারেন না। এই কথা বলে তিনি শেখের দেয়া পাগড়ি এবং গাউন মসজিদের এক কোণায় রেখে দিলেন।

অগ্রজ মোল্লা আব্দুল্লাহ সকাশে শিরবানে

মোল্লা সাঈদ বড় ভাই মোল্লা আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য শিরবান ভ্রমণ করেন। শিরবানে পৌঁছার পর দুই ভাইয়ের সংলাপ নিম্নরূপ :

মোল্লা আব্দুল্লাহ : তুমি ওখানে থাকাকালে আমি শের-ই-শেমদি' শেষ করেছি। তুমি কি পড়েছ?

মোল্লা সাঈদ : আমি ৮০টি বই পড়েছি।

মোল্লা আব্দুল্লাহ : তুমি কি বলছো?

মোল্লা সাঈদ : জি হ্যাঁ আমি ৮০টি বই পড়ে শেষ করেছি এবং সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আরো অনেক বই পড়েছি।

মোল্লা আব্দুল্লাহ বিশ্বাস করতে পারেননি যে, তার ছোট ভাই এত অল্প সময়ে এত বই কি করে পড়লো। তাই তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে সাঈদ রাজি হলেন। মোল্লা আব্দুল্লাহ তাকে অনেক প্রশ্ন করে পরীক্ষা করলেন এবং এ ব্যাপারে তার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে সাঈদ মিথ্যা দাবি করেনি। এতে বিস্মিত হলেও মোল্লা আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাইকে নিজের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করলেন। নিজের ছাত্রদের দৃষ্টির আড়ালে তিনি মোল্লা সাঈদের নিকট দীক্ষা নেয়া শুরু করলেন। মাত্র আট মাস আগে যে আব্দুল্লাহ তার ছোট ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন সেই ছোটভাই এখন আব্দুল্লাহর শিক্ষক।

শিরতে মোল্লা সাঈদ

মোল্লা সাঈদ ভাইয়ের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে শিরতের পথে যাত্রা করলেন। সেখানে প্রথমবারের মতো সাঈদ আলেমদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। তিনি তাদের প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দান করে বিতর্কে বিজয়

লাভ করায় আলেমরাও তার ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হন। শিরতে পৌঁছে সাঈদ মোল্লা ফতেউল্লাহ এফেন্দির বিখ্যাত মাদরাসায় যান।

আব্দুল্লাহর মতো মোল্লা ফতেহউল্লাও সাঈদের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যে অভিভূত ও বিস্মিত হন। তিনি সাঈদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে হতবাক হয়ে যান। একবার কোনো কিছু পাঠ করলেই সাঈদ তা হুবহু মুখস্থ বলতে পারেন। সাঈদ সম্পর্কে মোল্লা ফতেহউল্লাহর মন্তব্য "প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এই দুই অসাধারণ গুণের সমন্বয় এক ব্যক্তির মধ্যে হওয়াটা খুবই দুর্লভ ঘটনা।"

শিরতে অবস্থানকালে সাঈদ ইসলামের আইন শাস্ত্রের চার মাযহাবের মূলনীতি সংক্রান্ত লিখিত বিখ্যাত শাফী পণ্ডিত লিখিত গ্রন্থটি পুরো মুখস্ত করে ফেলেন। উক্ত 'জেমিউল জেভামি' গ্রন্থটি প্রতিদিন ২ ঘণ্টা পড়ে মোল্লা সাঈদ মুখস্থ করেন বলে মোল্লা ফতেহউল্লাহ তার আরবি ভাষায় লিখিত এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক সপ্তাহে এই গ্রন্থটি মুখস্থ করেন মোল্লা সাঈদ। ১৯৪৬ সালে এমিরদা কারাগারে থাকা অবস্থায় বদিউজ্জামানের লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়, উল্লেখিত বিস্ময়কর মেধাশক্তির জন্যই মোল্লা ফতেহউল্লা এফেন্দি মোল্লা সাঈদকে বদিউজ্জামান বা 'জামানার বিস্ময়' নামে ভূষিত করা হয়। তখন থেকেই তিনি বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী।

সাঈদের মেধা ও বিচক্ষণতার খ্যাতি শিরতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে আলেম সমাজ সম্মিলিত হন এবং সাঈদকে প্রশ্নের উত্তর দানে এবং বিতর্কে আহ্বান জানান। সাঈদ আলেম সমাজের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দান করেন এবং সাফল্যের সাথে বিতর্কে জয়লাভ করেন। শিরতের জনগণ যারা উল্লেখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারা সাঈদের বিদ্যাবুদ্ধির উচ্চসিত প্রশংসা করেন এবং তাকে একজন ওলী বা সাধক হিসেবে সম্মান করেন। কিন্তু অল্প বয়সে সাঈদের অসাধারণ কৃতিত্বে অনেকেই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পেরে তারা সাঈদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে এবং তাকে ঘায়েল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। জন সাধারণের হস্তক্ষেপে তারা সাঈদের কোনো তি করতে পারেনি।

এভাবেই সাঈদ এখানে সাঈদ-ই-মশদুর বা বিখ্যাত সাঈদে পরিণত হয়। দৈহিকভাবেও সাঈদ ছিলো শক্ত-সামর্থ্য এবং বলীয়ান। এ সময় তিনি খেলাধুলাতে ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন এবং সে ক্ষেত্রেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি নিজে কাউকে প্রশ্ন করতেন না বরং তাকে যত প্রশ্ন করা হতো তার যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক জবাব দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

শিরত নামক স্থানে তিনি আরও কিছু সময় অবস্থান করেন। বাগদাদের পথে না গিয়ে আবার সাঈদ বিতলিসে শেখ আমিনের মাদরাসায় ফিরে যান। কিন্তু এবারও সাঈদ কম বয়স ও ছোট বলে শেখ তার অবমূল্যায়ন করেন। সাঈদ বিনয়ের সাথে শেখকে বলেন, আমাকে সুযোগ দেয়া হলে আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবো। শেখ আমিন এবার সাঈদকে ১৬টি অতি কঠিন প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সাঈদ দৃঢ়তার সাথে সবগুলো প্রশ্নের যথার্থ জবাব দান করেন। এ সময় সাঈদ বিভিন্ন মসজিদ ও সভা-সমাবেশে বক্তব্যদান শুরু করেন। অতি অল্প সময়ে এই যুবক বিতলিসের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কিন্তু এর ফল হয় দ্বিমুখী। বিতলিসের মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ সাঈদের সমর্থক এবং অপর এক অংশ শেখ আমিনের সমর্থক। ফলে সংঘাত এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশংকায় প্রদেশের গভর্নর সাঈদকে বিতলিস থেকে বহিষ্কার করেন এবং সাঈদ আবার শিরওয়ানে ফেরত যান।

শিরওয়ানেও সাঈদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি বাধা বিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। কিছু শিক্ষক ও স্বল্পজ্ঞানী বিদ্যার্থী যারা অতীতে সাঈদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাস্ত হয়েছিলেন তারা সাঈদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। সাঈদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়ে তারা জনগণকে উস্কানি দিতে থাকে। কিছুদিন পর সাঈদ শিরত জেলায় টিল্লো নামক শহরে গমন করেন। শহরতলীতে পাহাড়ের উপর একটি ছোট পাথরের দালানে সাঈদ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। সাঈদ বিখ্যাত আরবি অভিধান কামুসের ১৪তম বর্ণ 'সিন' পর্যন্ত এখানে মুখস্ত করে ফেলেন। এখানে অবস্থানকালে তার ছোটভাই মেহমুদ প্রতিদিন তার জন্য খাবার বহন করে আনতো। খাবারের একটি অংশ তিনি পিপীলিকাদের দিয়ে দিতেন। পিপীলিকাদের সংঘবদ্ধ পরিশ্রমী জীবন ও শৃঙ্খলা তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। আর এ কারণেই তিনি উপহার হিসেবে তার খাবারের বেশিরভাগ তাদের দান করে দিতেন। পিপীলিকাদের কাহিনী তাকে রাজনৈতিকভাবে আলোড়িত করে। টিল্লো শহরে অবস্থানকালে সাঈদ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সাথে সৌহার্দ্য সৃষ্টিকারী এবং ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ করার উদ্দীপনা লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, বিখ্যাত সূফী সাধক আব্দুল কাদের জিলানী মিরান গোত্রের প্রধান মোস্তাফা পাশার নিকট গিয়ে তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে বলছেন। তিনি মোস্তফা পাশাকে দীনের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করার আহ্বান জানান।

১৬ বছর বয়স্ক সাঈদদের জন্য ছিলো এটা এক কঠিন দায়িত্ব। মিরান গোত্র ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মোস্তফা পাশা ছিলেন হামিদিয়া রেজিমেন্টের কমান্ডার। কমান্ডার হিসেবে তিনি সাধারণভাবে নানা নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখ যে, সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এই হামিদিয়া রেজিমেন্ট গড়ে তোলেন। কুর্দি ও টার্দোম্যান গোত্রের সমন্বয়ে এই মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয় পূর্ব আনাতোলিয়ায় আর্মেনিয়ান সন্ত্রাস মুকাবিলা করার জন্য। গোত্র প্রধান এবং নিয়মিত বাহিনীর অফিসারদের দ্বারা ই রেজিমেন্ট পরিচালিত হতো। যা হোক, সাঈদ এখান থেকে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী সিজার এলাকায় গমন করেন। সেখানকার হিংস্র ও স্বেচ্ছাচারী গোত্র প্রধানদের সাথে সাঈদ সম্পর্ক স্থাপন করেন যাদিলো এক অতিদুঃসাহসী কাজ। এই শক্তিশালী ও অত্যাচারী গোত্রপতিদের সাথে কাজ করতে পারেন তারাই যাদের ভয় বলে কোনো কিছু নেই। সাঈদ এই ভয়ংকর দুঃসাহসী কাজটি করেছেন।

মোল্লা সাঈদ এবং মোস্তফা পাশা

সাঈদ মোস্তফা পাশার তাঁবুতে পৌঁছে জানতে পারেন তিনি অন্য কোথাও গিয়েছেন। এই সুযোগে তিনি সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করে নেন। কিছু পরেই মোস্তফা পাশা তার তাঁবুতে ফিরে আসেন। তার আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শুধু সাঈদ দাঁড়াননি। এটা পাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পাশা মেজর ফাত্তাহ বে কে জিজ্ঞেস করেন-এটা কে? মেজর ফাত্তাহ বলেন, ইনি 'বিখ্যাত মোল্লা সাঈদ।' মোস্তফা আলেম উলামাদের তেমন একটা গ্রাহ্য করেন না তবে নিজের রাগ সংযত করে বলেন, তিনি এখানে এসেছেন কেন? মোল্লা সাঈদ এ প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়তার সাথে বললেন, "স্বপ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়ে আমি এসেছি তোমাকে পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সঠিক পথে চালাবার জন্য। হয় তুমি তোমার স্বৈরাচারী আচরণ বন্ধ করবে এবং ফরজ এবাদতসমূহ পালন করবে অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করবো।"

সাঈদের জবাবে মোস্তফা পাশা সন্দেহাতীতভাবে বিস্মিত হয় এবং বিষয়টি নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য তাঁবুর বাইরে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন এবং আবার জিজ্ঞেস করেন, সাঈদ এখানে কেন এসেছেন। সাঈদ এবারও জবাবে একই কথা বলেন। আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর মোস্তফা পাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মোল্লা সাঈদ এবং সিজারের ধর্মীয় পণ্ডিতদের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মোল্লা সাঈদ যদি বিজয়ী হন তাহলে তিনি তার নির্দেশ মেনে চলবেন। যদি এর অন্যথা হয় তাহলে মোল্লা সাঈদকে এই নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। একথা শুনে সাঈদ

ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচল আস্থাশীল এবং বললেন, আমার পক্ষে যেমন সমস্ত ওলামাকে নিস্তব্ধ করে দেয়া সম্ভব নয় তোমার পক্ষেও আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাদের প্রশ্নের জবাব দিবার পর আমি তোমার নিকট একটি রাইফেল চাই এবং যদি তুমি তোমার কথা রক্ষা না করো তাহলে সেই রাইফেল দিয়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো।"

উপরোক্ত কথোপকথনের পর তারা ঘোড়ায় উঠলেন এবং সিজারের গোচারণ ভূমির দিকে যাত্রা করলেন। মোস্তফা পাশা পথে মোল্লা সাঈদের সাথে আর কোনো কথা বললেন না। তাইগ্রীসের তীরে বানিহান নামক জায়গায় তারা যখন এলেন, মোল্লা সাঈদ প্রশান্তির সাথে একটা ঘুম দিলেন। সামনে তার পরীক্ষার ব্যাপারে সাঈদ পুরো আস্থাশীল ও আত্মবিশ্বাসী। ঘুম থেকে সাঈদ জেগে উঠে দেখলেন এই এলাকায় পণ্ডিতগণ সমবেত হয়েছেন অনেক গ্রন্থ হাতে।

সাঈদের জন্য তারা অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয় পর্বের পর চা পরিবেশন করা হলো। উপস্থিত আলেমগণ মোল্লা সাঈদের সুখ্যাতি এবং পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শুনেছেন তাই অতি সতর্কতার সাথে তারা প্রশ্ন তৈরি করেছেন। সাঈদ নিজের জন্য নির্ধারিত চা খেলেন এবং তাদেরটাও খেলেন। এটা লক্ষ্য করে মোস্তফা সমবেত পণ্ডিতদের জানালেন যে, তার মনে হচ্ছে তারা পরাজিত হবেন।

মোল্লা সাঈদ বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে কোনো প্রশ্ন করবো না। শুধু আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিব। পণ্ডিতগণ তাকে ৪০টি প্রশ্ন করেন এবং মোল্লা প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক ও সঠিক জবাব দান করেন মাত্র একটি বাদে। সেই একটি প্রশ্নের জবাব যা শুদ্ধ বা সঠিক জবাব ছিলো না সেটা কিন্তু পণ্ডিতগণ বুঝতে পারেননি। বরং মেনে নিয়েছেন সঠিক জবাব হিসেবে।

অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখন মোল্লা সাঈদ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে প্রশ্নটার জবাব সম্পর্কে এবং শুদ্ধ উত্তরটি তাদেরকে অবহিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দেন যে অশুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করার মতো জ্ঞানও তাদের নেই। অতঃপর সমবেত পণ্ডিতগণ পরাজয় স্বীকার করে নেন। তাদের অনেকে মোল্লা সাঈদের ছাত্র হিসেবে তার অধীনে অধ্যয়ন শুরু করেন। মোস্তফা পাশা তার প্রতিশ্রুত রাইফেলটি মোল্লা সাঈদকে দান করেন এবং ইসলামের নির্ধারিত বাধ্যতামূলক বিধানসমূহ পালন করা শুরু করেন।

মোল্লা সাঈদ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তেমনি দৈহিকভাবেও ছিলেন শক্তিশালী এবং বলীয়ান। বিশেষ করে কুস্তি লড়াইয়ে তিনি ছিলেন অনন্য।

মাদরাসায় তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কুস্তি লড়াই করতেন। কুস্তিতে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারতো না।

একবার মোল্লা সাঈদ এবং মোস্তফা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। ওদিকে মোস্তফা পাশা সাঈদের জন্য এমন একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যে ঘোড়াটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না এবং ঘোড়াটি ছিলো নিয়ন্ত্রণহীন। মোল্লা সাঈদ ঘোড়াটিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান করার চেষ্টা করতেই ঘোড়াটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কোনক্রমেই সাঈদ ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। এক পর্যায়ে ঘোড়াটি একটি শিশুকে পদদলিত করে সামনে ছুটে চলে। শিশুটি ঘোড়ার পদাঘাতে আহত হয়ে নিষ্প্রাণ দেহে লুটিয়ে পড়ে। সমবেত দর্শকরা শিশু হত্যার কারণে সাঈদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সময় সাঈদ তার রিভলবার বের করে বলেন, আপনারা যদি বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে শাস্তি প্রাপ্ত মোস্তফা পাশার। কারণ পাশাই আমাকে এই ঘোড়াটি দিয়েছেন। অপেক্ষা করুন, আমাকে শিশুটিকে দেখতে দিন। শিশুটি কোলে নিয়ে তিনি দেখলেন তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। এরপর তিনি শিশুটিকে নদীর ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে আবার উঠিয়ে আনলেন। বিস্ময়করভাবে শিশুটি হেসে চোখ মেলে তাকালো। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সমবেত জনতা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার পর সাঈদ মোল্লা খুব অল্প সময়ই ঐ এলাকায় ছিলেন। এখান থেকে তার এক ছাত্রের মরুভূমি এলাকায় যাযাবর আরব গোত্রসমূহের জন্য কাজ করতে যাওয়ার চিন্তা করলেন। খুব বেশি সময় তিনি মরু এলাকায় ছিলেন না। যখন শুনলেন মোস্তফা পাশা পুনরায় তার পুরনো স্বভাবে ফিরে গিয়েছেন এবং মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করছেন। তিনি পাশাকে সতর্ক করতে ফিরে আসলেও ব্যর্থ হন কারণ পাশা তার ভালো উপদেশ মানতে রাজি ছিলেন না। পাশার ছেলের হস্তক্ষেপে পাশা কর্তৃক অপদস্থ হওয়া থেকে মোল্লা সাঈদ রক্ষা পান এবং পাশার ছেলের অনুরোধে অবশেষে বিরো মরু অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন।

সাঈদ দু'বার যাযাবর ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হন। দ্বিতীয় হামলায় সাঈদ মারাই যেতেন কিন্তু যাযাবররা তার পরিচয় জানতে পেরে তাকে হামলার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে এবং তার সফরে বাকি পথ অতিক্রম করতে নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব করে। সাঈদ তাদের সহযোগিতা ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। একাকী সাতদিন সফর করে মারদিন নামক স্থানে পৌঁছেন।

বদিউজ্জামানের শেষ দিনগুলো

আমিরদাউ ফিরে আসার পর বদিউজ্জামান মেন্দারেস এবং তার সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করেননি। তারপক্ষে যা করা সম্ভব ছিলো সেই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তিনি বলেছেন, প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এখন তাদের হস্তক্ষেপেই তিনি আর কিছু করতে পারছেন না। উল্লেখ্য যে, তার সর্বশেষ আনকারা সফরের সময় পুলিশ তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দান করে বলেছে, কেবিনেটের সিদ্ধান্ত আপনি আমিরদাউ গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। বদিউজ্জামান এরপর আমিরদাউ চলে এসেছেন বিশ্রামের জন্য। তার অন্যতম ছাত্র সাঈদ উজদামির বলেছেন, বদিউজ্জামান মন্তব্য করেছেন, "মেন্দারেস আমাকে বুঝতে পারেননি। আমি শিগগিরই চলে যাব এবং তারাও যাবেন, ওলটপালট হয়ে যাবে, চিতপাত হয়ে যাবে"। দুঃখজনকভাবে সরকার বিরোধী দলের চাপের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছেলদিছ। প্রতিদিন বিরোধী আক্রমণের মুখে সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ইতোমধ্যে সামরিক কর্তারা ইনোনুর বাসভবনে এসে তার সাথে শলাপরামর্শ করে গেছেন। সামরিক বিপ্লবের পরিকল্পনা চূড়ান্ত। বদিউজ্জামানের মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই মেন্দারেস সরকারের পতন ঘটলো।

আমিরদাউয়ে তিনি আটদিন অবস্থানের পর ২০ জানুয়ারি তিনি ইসপারতায় যান এবং ১৭ মার্চ পর্যন্ত সেখানে তার ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিও প্রদান করেন। তিনি দুই দিনের জন্য আবার আমিরদাউ আসেন এবং সেখানে আসার পর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে। ডাক্তার ডাকা হয়। তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বদিউজ্জামান কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার তাকে একটি পেনিসিলিন ইনজেকশন দেন। বদিউজ্জামান কিছুটা সুস্থবোধ করেন এবং চোখ মেলে তাকান এবং মৃদু হেসেছেন। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন :

আমার ভাইয়েরা! এই দেশে এখন রিসালায়ে নূর বিরাজ করছে। এটি ম্যাশন এবং কমিউনিস্টদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। তোমাদের কিছু কষ্টভোগ করতে হবে তবে শেষটা তোমাদের জন্য সত্যিই ভালো হবে।"

সকালে অবস্থার আরও একটু উন্নতি হলো। তিনি ইসপারতার পথে রওনা করলেন। অন্যান্য সময় তিনি যা করতেন না তার ব্যতিক্রম করলেন। তিনি সবাইকে করুণভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন চালিশদান পরিবার এবং আমিরদাউয়ে তার ছাত্রদের প্রতি।

১৯ মার্চ বিকেলে বদিউজ্জামান ইসপারতা পৌঁছলেন। তাহিরি মুতলু ও বৈয়াম ইউফসেল তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। এক ঘণ্টা আগে পুলিশ এসে তাদের বলেছে, তারা আমিরদাউ ত্যাগ করেছেন। অনেক কষ্ট করে তাকে গাড়ির পিছনের সিট থেকে নামিয়ে দোতলায় নেয়া হয়। রাত দুইটায় বদিউজ্জামানের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। তিনি বলতে থাকেন-'আমরা উরফা যাচ্ছি।'

তারা মনে করেছিল যে জ্বরের কারণে হয়তো এ রকম কিছু একটা বলছেন। কিন্তু বদিউজ্জামান বারবার উচ্চারণ করছিলেন আমরা উরফা যাচ্ছি। গাড়ির টায়ার মেরামত করার প্রয়োজন ছিলো। বদিউজ্জামান অন্য গাড়ি ভাড়া করতে বললেন। ইতোমধ্যে গাড়ি মেরামত হয়ে গেল। পিছনের সিটে তার শোবার মতো ব্যবস্থা করা হলো। ২০ মার্চ সকাল ৯টায় উরফা যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত। দু'জন পুলিশ নজরদারি করছিল। বাড়ির সামনে তাহির আগা যে পাহারা দিচ্ছিল যাতে কোনো পুলিশ বা কেউ যাতে অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে। যাত্রার সময় বদিউজ্জামান বাড়ির মালিক ফিতনাত খানুমের কাছ থেকেও বিদায় নিলেন।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এর মধ্যেই আমরা বের হয়ে গেলাম ইয়োবিদির পথে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে বদিউজ্জামানের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। একটি পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে গাড়ি থামানো হলো। এবার তিনি গাড়ি থেকে বের হয়ে আবার ঝর্ণার পানিতে অজু করে নামায আদায় করলেন। আবার রওনা করা হলো। কোনিয়ায় এসে গাড়ি থামানো হলো। কিছু পানির এবং জয়তুন কিনা হলো ইফতার করার জন্য। বদিউজ্জামানের সঙ্গী ছাত্ররা সবাই তখন আয়াতুল কুরসী পড়তে ছিলেন। কারণ কোনিয়ার বৈরী গভর্নর শপথ করেছিলেন বদিউজ্জামানের ছাত্রদের সমূলে উৎখাত করার জন্য।" তার এই বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম, হয়েছিল। তারা মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মসজিদের পাশ কাটিয়ে নিরাপদেই কোনিয়া শহর অতিক্রম করলেন।

সূর্যাস্তের সময় তারা এসে পৌঁছলেন উলুকিচলার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিলো। বদিউজ্জামান কিছু খেতে পারলেন না। অন্ধকারেই তারা আদানা পার হলেন এবং জিহান নামক স্থানে পৌঁছে এশার নামায আদায় করলেন। এ সময় গাড়ির চালক এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেন। সেহরীর সময় তারা ওসমানিয়া পৌঁছলেন এবং গাড়িতে পেট্রোল নিলেন। বদিউজ্জামান সেহরীতেও কিছু খেতে পারলেন না। ২১ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় তারা গাজিয়ানতেপ নামক স্থানে পৌঁছলেন। যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। রাস্তা খুব খারাপছিলো। বরফ ও কাদা একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই তারা সকাল ১১টায় উরফা পৌঁছলেন। এ দিন ছিলো সোমবার।

উরফায় বদিউজ্জামান

উরফায় পৌঁছে তারা কাদিউলু মসজিদে যান। এখানে স্কুল জীবন থেকে বদিউজ্জামানের ছাত্র আব্দুল্লাহ ইয়োয়িন থাকেন। তিনি এখানে একটি রিসালায়ে নূর সেন্টার স্থাপন করেছেন। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারলেন আইপাক প্যালেস হোটেল এখানকার সবচাইতে ভালো হোটেল। বদিউজ্জামানকে সেই হোটেলে নেয়া হলো। তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। কার্যত তার ছাত্ররা তাকে বহন করে নিয়ে হোটেলের ৪র্থ তলার ৭নং কক্ষে তুললেন। বদিউজ্জামানকে হোটেলে নেয়ার পর পুলিশ এবং

বদিউজ্জামানের ছাত্র, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে বিরাট সংঘাতের সূচনা হলো। আনকারা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ বদিউজ্জামনকে ইসপারতায় ফেরত পাঠানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ শুরু করে। এদিকে বদিউজ্জামান এবং উরফার জনগণ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

বদিউজ্জামানকে উরফার জনগণ একটি অসাধারণ সংবর্ধনা দেয়। তারা দলে দলে হোটেলের চারদিকে সমবেত হতে থাকেন। জনস্রোত যেন বন্ধ হচ্ছিল না। ইউফসেল বাধ্য হয়ে বদিউজ্জামানকে হাত ধরে রাখেন যাতে জনতা তার হাতে, চুমো দিতে না পারে। বদিউজ্জামান যদিও এটাকে খুব নিরুৎসাহিত করতেন, তথাপি তিনি জনতার আগ্রহে তাদেরকে এভাবে দর্শন দেন। সর্বশ্রেণীর লোক বদিউজ্জামানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন– ব্যবসায়ী, সেনা অফিসার, পুলিশ, সৈনিক, সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ। শত শত মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বদিউজ্জামান উরফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, উরফার জনগণের ইসলামের প্রতি খেদমত এবং তারা তুর্কি, আরব ও কুর্দিশ। সুতরাং তারা ঐক্য এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হতে পারেন। শারীরিকভাবে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উরফার জনগণকে এভাবেই তিনি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন।

এ সময় সাদা পোশাকে প্রথমে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা আসেন এবং বদিউজ্জামানের ছাত্র বলেন, আপনারা প্রস্তুত হন ইসপারতায় ফেরত যেতে হবে। আরো অনেক সংখ্যক পুলিশ এসে জমা হয়। তারা বদিউজ্জামানকে সরকারের সিদ্ধান্ত জানান। বদিউজ্জামান বলেন, "কি তাজ্জব ব্যাপার! আমি এখানে এসেছি মৃত্যুবরণ করতে। এবং মনে হয় আমি মারা যাবো। আপনারা আমার অবস্থা দেখতে পারেন। আপনারা আমাকে সমর্থন করুন।"

তারা জবাব দিলেন, তাদের কাছে নির্দেশ আছে, তারা হুসনুকে সাথে নিয়ে এসেছে। গাড়ি হোটেলের সামনে অপেক্ষা করছে। এ পর্যায়ে হোটেল ম্যানেজার ও তার অতিথির সাথে এমন আচরণের প্রতিবাদ করেন। জনতা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ ও শ্লোগান দিতে থাকে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ হোটেলে প্রবেশ এবং জনতাকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং জনতা শান্ত হন। জনগণের বদিউজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ অব্যাহত থাকে।

পুলিশ আবারও পীড়াপীড়ি শুরু করে এই বলে যে, নির্দেশ সরাসরি আনকারা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নামিদ গেদিফের পক্ষ থেকে এসেছে। এটা চূড়ান্ত নির্দেশ। দরকার হলে বদিউজ্জামানকে এম্বুলেন্সে ইসপারতা পাঠানো হবে। বদিউজ্জামানের ছাত্ররা ঘোষণা দিলেন– এটা অসম্ভব। কোনো অবস্থাতেই পুলিশের এ নির্দেশ মানা হবে না। তাদের সাথে পুলিশের উত্তেজনাকর বাক্য বিনিময় হতে থাকে। মেন্দারেসের নিকট টেলিগ্রাম পাঠানো হতে থাকে।

উরফা থেকে আনকারার শত শত টেলিগ্রাম যেতে থাকে। উরফার জনগণ ঘোষণা দেন তারা কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে বদিউজ্জামানকে যেতে দিবেন না।

খবর ছড়িয়ে পড়ে বদিউজ্জামানকে উরফা থেকে বহিষ্কার করা হবে। উরফা শাখা ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান খবর পেয়ে হোটেলে চলে আসেন। বদিউজ্জামান আমাদের সম্মানিত অতিথি তার সাথে এ ধরনের আচরণের প্রশ্নই উঠে না। ডেমোক্রেট পার্টির চেয়ারম্যান তার রিভলবার বের করে পুলিশ চিফের টেবিলের উপর আঘাত করেন। তারা যদি শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তার উপরই প্রথমে তা করতে হবে। ইতোমধ্যে ৫/৭ হাজার মানুষের ভিড় জমে গেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সরকারি ডাক্তার আনান এবং বদিউজ্জামানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তখন তার শরীরে তাপমাত্রা ছিলো ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডাক্তার বললেন বদিউজ্জামানের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তিনি সফরের উপযোগী নন। প্রতিদিন তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

পরদিন ছিলো মঙ্গলবার। বদিউজ্জামানের ছাত্ররাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বৈয়াম দুই ঘণ্টার জন্য ঘুমানোর সময় জুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ ইয়োইন বদিউজ্জামানের কাছে থাকেন এবং তার স্বাস্থ্য দেখাশোনা করেন। বদিউজ্জামানের উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর ছিলো। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। দিনের বেলায় তিনি সামান্য বরফ চেয়েছিলেন। কিন্তু কাছে যারা ছিলেন তারা বরফ জোগাড় করতে পারেননি। তার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিলো। বৈয়াম ভিজা রুমাল দিয়ে তা মুছে দিচ্ছিলেন। এই তাপমাত্রা জ্বর নতুন। ভোর ২-৩০ মিঃ। এর সময় থেকে বদিউজ্জামান শরীরের উপর কাপড় সরিয়ে ফেলছিলেন। বৈয়াম কাপড় তার উপর তুলে ঢেকে দিচ্ছিলেন। কক্ষে আলোর উজ্জ্বলও কমানোর জন্য ভৈয়াম লাইটের উপর কাপড় পেঁচিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বদিউজ্জামান তার হাত দিয়ে বদিউজ্জামানের গলায় স্পর্শ করেন। অতঃপর তার হাত বুকে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অথবা বৈয়াম মনে করে যে, বদিউজ্জামান ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু বদিউজ্জামান ঘুমাননি। তার জীবন চলে গিয়েছে এবং তার আত্মা উড়ে গিয়েছে অনন্তলোকে। এটা ছিলো ভোর তিনটা, ২৩ মার্চ বুধবার, ১৯৬০ সাল, ২৫ রমজান ১৩৭৯ হিজরি।

বদিউজ্জামানকে দাফন করা হলো খলিলুর রহমানের দরগায়

বৈয়াম স্টোভের তাপ বাড়িয়ে দিলেন যাতে বদিউজ্জামানের ঠাণ্ডা না লাগে। কারণ সে ভাবছিল তিনি ঘুমাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর জুবায়ের এবং অন্যরা আসলো। বদিউজ্জামানের শরীর গরম, কিন্তু শব্দ আসছে না। ওয়াজ ওমর আফেন্দী একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় বক্তিত্ব, তিনি উরফা সফর করছিলেন তখন। তিনি এসে কক্ষে প্রবেশ করে বদিউজ্জামানকে দেখে উচ্চারণ

কোর্ট মার্শাল, জেল-জুলুম, নির্যাতন, কারাবরণ, মামলা-মোকদ্দমাসহ সব ধরনের হয়রানি নির্যাতন পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন।

ক্ষুরধার লেখনী তীক্ষ্ণ যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমালোচকদের আক্রমণের মোকাবিলায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ বক্তব্য উপস্থাপন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা, তাদের দোসর কমিউনিস্ট শক্তির মেরুদণ্ড তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে যারা ধর্মের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ঈমানকে আরও বেশি মজবুত ও শাণিত করে। তিনি পশ্চিমাদের থেকে বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া আর কোনো কিছুই গ্রহণে রাজি ছিলেন না।

তার জীবনের তিনটি অধ্যায়কে গভীরভাবে না বুঝলে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতি যে ধরনের হিকমা এবং বিচক্ষণতা প্রয়োজন বদিউজ্জামান তার অধিকারী ছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইতিবাচক বিকল্প উদ্ভাবন এবং নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার যে দিকনির্দেশনা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তা বদিউজ্জামানের জীবনের একটি অন্যতম বড় অবদান। তার দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে রিসালায়ে নূর। আজকের তুরস্ক যেভাবে কৌশলগত অবস্থান ঠিক রেখে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসছে এটা মূলত সাঈদ নূরসীর আন্দোলনেরই ফসল। পদ, পদবী ছাড়াও যে দেশ, জাতি এবং মানবতার জন্য অবদান রাখা যায় তার বড় ধরনের নজির স্থাপন করে গিয়েছেন সাঈদ নূরসী। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্ততার প্রশ্নে তিনি একটি কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের সুযোগ আছে। কিন্তু দেখতে হবে কোনটা ফলপ্রসূ। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে সাময়িকভাবে নিজেকে প্রত্যাহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে তার চিন্তাও অবসানকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ধীরে ধীরে তুরস্কে এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও যে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তার পিছনে বদিউজ্জামানের মতো বিগত শতাব্দী এবং বর্তমান শতাব্দীতে যারা ইসলামের জন্য কাজ করতে গিয়ে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন তাদের এক বিরাট অবদান আছে। বদিউজ্জামান যে আলো দেখাতে পেরেছিলেন সেই আলো যেনো ক্রমান্বয়ে আরও সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং সেই আলোই একদিন গোটা পৃথিবীটাকে আবার আলোময় করে তুলবে।

সমাপ্ত